তৃতীয় অধ্যায়
দেবেশ রায়ের ছোটগল্পের ক্রমবিবর্তন

গল্পকার দেবেশ রায়ের সাহিত্য জীবনের যাত্রা শুরু ১৯৫৫ সালে 'হাড়কাটা' গল্প দিয়ে। সেই সময় তিনি জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় এই গল্পটি প্রকাশ হতেই তিনি যেন পাকাপাকি ভাবে গল্পকার হয়ে উঠলেন। যদিও তার আগে কলেজের কাগজে স্থানীয় সাহিত্য পত্রে বা এমনকী স্কুলে পড়ার সময় স্থানীয় পত্রিকাতেও লেখালেখি ছাপা হয়েছিল প্রায় প্রতিনিয়তই। এই প্রসঙ্গে গল্পসমগ্রের প্রথম খণ্ডের ভূমিকা অংশে গল্পকার লিখেছেন—

> ''কোন একটি আরম্ভের সময় যদি আমাকেই চিহ্নিত করতে হয় তাহলে 'দেশ' এর এই গল্পটিকেই আমার নান্যোপায় বেছে নিতে হয়। তার আগের কোন গল্পে প্রকাশ্যতা এতটা স্পষ্ট ছিল না।''[১]

১৯৫৫ সাল তাঁর গল্পকার জীবনের আরম্ভ কাল। পরবর্তীকালে তাঁর জীবনাভিজ্ঞতা ও কালের বিবর্তনের মধ্যদিয়ে তাঁর গল্পের ক্রমবিবর্তন ঘটেছে। স্বয়ং গল্পকার সময়ের দিক থেকে তাঁর গল্পগুলিকে কয়েকটি খণ্ডে বা পর্বে ভাগ করেছেন।

১. গল্পসমগ্র	-	প্রথম খণ্ড	-	১৯৫৫-১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ
২. গল্পসমগ্র	-	দ্বিতীয় খণ্ড	-	১৯৬২-১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ
৩. গল্পসমগ্র	-	তৃতীয় খণ্ড	-	১৯৬৮-১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ
৪. গল্পসমগ্র	-	চতুর্থ খণ্ড	-	১৯৭৮-১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ
৫. গল্পসমগ্র	-	পঞ্চম খণ্ড	-	১৯৮৭-১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ
৬. গল্পসমগ্র	-	ষষ্ঠ খণ্ড	-	১৯৯৫-১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ

১৯৫৫ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত গল্পগুলির সংকলন গল্পসমগ্র প্রথম খণ্ড। এই খণ্ডে ২১টি গল্প সংকলিত হয়। গল্পকার তাঁর গল্পগুলিকে রচনা কালের দিক থেকে ভাগ করেছেন। তবে তিনি পাঠককে নিজের মতো করে ভাগ করে নেবারও স্বাধীনতাও দিয়েছেন। তিনি নিজেই জানিয়েছেন—

''গল্প লেখার ভিতরের দিক থেকে এরকম একটা ভাগ সম্ভব মনে হল। পরবর্তী খণ্ডগুলিও সময়ের দিক থেকেই ভাগ হবে। এরকম ভাগাভাগিতে আপাতত হয়তো আমার নিজের ধারণাই প্রাধান্য পাচ্ছে কিন্তু পাঠকের হাতে তো সেই চরম অধিকার থেকেই গেল যার জোরে তিনি তছনছ করে দিতে পারেন লেখকের আরোপিত ধারণা বা ছক।''[২]

গল্পকার দেবেশ রায় তাঁর গল্পসমগ্রের প্রথম খণ্ডে সেই সময়ের লেখাগুলিকে রাখতে চেয়েছেন যে সময় তিনি গল্প ছাড়া আর অন্য কিছু বা অন্য কোন চেহারায় লেখালেখির কথা ভাবতেই পারেন নি। যদিও ১৯৬১ সালের পর তিনি উপন্যাস লেখার কথাও ভাবতে শুরু করেছিলেন। গল্প সমগ্রের প্রথম খণ্ডের ভূমিকা অংশে স্বয়ং লেখক এই কথা জানিয়েছেন—

''১৯৬১-র শুধু গল্পেরই ওপর আমার এই অনন্য নির্ভরতা কমে আসে। তখন উপন্যাসও ভাবতে শুরু করেছি।''[৩]

'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম গল্প 'হাড়কাটা'। 'হাড়কাটা' গল্পটির পাত্র-পাত্রী মধ্যবিত্ত শ্রেণির নয়। প্রধান চরিত্র নানকু কাহার। জলপাইগুড়ি শহরের অন্ত্যজ মেথর বস্তির পাশেই তার বাড়ি। পেশায় মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের লাইসেন্সিয়েট কশাই। লোকে ওকে আড়ালে ডাকে 'হাড়কাটা'। জীবন জীবিকা হিসেবে সে বেছে নিয়েছে এই পেশাকেই। সংসারের নিত্য দারিদ্র্য যন্ত্রণা তাকে প্রতি মুহূর্তে কুঁড়ে কুঁড়ে খায়। সহধর্মিণী গাধুলি সন্তানের প্রতি অপত্য বাৎসল্য স্নেহে তাকে পাঁঠার 'মাট্টা' নিয়ে আসতে বললে জবাব দিয়ে বসে— 'নিজের মেটে কাটায় দিস'। আসলে সংসারের চরম আর্থিক দুরর্দশা সেই সঙ্গে কশাইয়ের পেশা তাকে কোথাও যেন ধীরে ধীরে সামাজিক সত্তা থেকে ক্রমশ দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। রাত্রিবেলায় তার মনে হয়- 'সমস্ত পৃথিবীটা হয়ে গেছে কাল কটকটে একটা বিচ্ছিরি পেত্নি।' কিংবা তার মনে হয়—'শালা দুনিয়াটাই বেইমান।' হঠাৎই মনে পড়ে বছর দশেক আগে গাধুলির সাথে তার রোমান্টিক প্রণয় আখ্যান ও সংসার জীবনে প্রবেশের কথা। দুটি নর-নারীর নিম্নবৃত্তিয় সাধারণ জীবন যাপনের চিত্রই গল্পকার 'হাড়কাটা' গল্পটির মধ্যে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি নিম্নবিত্ত শ্রেণি থেকে চরিত্র নির্বাচন করে এদের মধ্যে দিয়ে

গল্পকার সমাজের কিছু বাস্তব সত্য এবং পরিসমাপ্তিতে রোমান্টিকতার মিশ্রণে আখ্যান সংঘটিত করেছেন। যদিও ছোটগল্পের নিরিখে গল্পটির বুনট তেমন জমে ওঠেনি তবুও এই গল্পের মধ্যদিয়ে দেবেশ রায়ের গল্পকার হিসেবে আত্মপ্রকাশের জন্য ও তাঁর ছোটগল্পের ক্রমশ বিবর্তনের 'হাড়কাটা' গল্পটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তিনি মনে হয় কেবলমাত্র এই গল্পেই কুশীলবদের মধ্যবিত্তেতর শ্রেণি থেকে নির্বাচন করেছিলেন এবং এই গল্পের সার্বিক দুর্বলতাই প্রমাণ করে, কেন তিনি আর ও পথে ফিরে যাননি।

দেবেশ রায়ের প্রথম তাৎপর্যপূর্ণ গল্প 'দুপুর' প্রকাশিত হয় 'দেশ' পত্রিকায় ১৯৫৮। এই গল্পে একটি দুপুরকে কেন্দ্র করে একটি পরিবারের মা, বাবা, দুই মেয়ে ও ছেলের অনুভূতি ও ভাবনা, তাদের আশা-আকাঙক্ষা বেদনার প্রতিফলনই লেখকের উদ্দেশ্য। দুপুরের বর্ণনায় গল্পকার লিখছেন— ''দুপুর। টইটম্বুর, টসটস করছে দুপুরটা। মধ্য সমুদ্রের মত নিস্তরঙ্গ, বিরাট ব্যাপক; চুম্বক পাহাড়ের মত আকর্ষক; ফুলশয্যার পুরুষের মত স্থির, সবল, জ্বলন্ত।''[৪] একটি তরণী, সতীর কাছে দুপুর এই ভাবেই প্রতিভাত হয়েছে। যতীনবাবু অর্থাৎ বাবার কাছে দুপুর যেন 'অনেক ছেলের মা, শিথিল দেহ, শ্লথ যৌবন নারীর মত দুপুরটা হাঁফসাচ্ছে। জিভ আর দু-পাশের দুটো ছুঁচল দাঁত বের করে দুপুরটা পড়ে আছে মাদি কুকুরের মত।'[৫] মা অর্থাৎ রেণুবালার কাছে দুপুরটা যেন 'ছোট্টখাট্ট ভুঁড়িঅলা মাঝ বয়সি এক ভদ্রলোকের মত দুপুরটা ঘুমুচ্ছে। দুপুরের শরীরের শক্তিটা চর্বি হয়ে যাচ্ছে; চর্বিটা হাড়টাকে ঢেকে দিচ্ছে, হাড়ের স্পর্শ আর পাওয়া যায় না, মোটা থলথলে ভুঁড়ি যেন গাঁয়ের সঙ্গে লাগে আর পিছলয়।'[৬] বিশ বছরের তরুণী মায়ার কাছে—'ফটোয় দেখা পুরুষকে কল্পনা করার মতই বাস্তব অথচ অলীক। আর আশঙক্ষায় দুরুদুরু, সম্ভাবনায় রঙিন, ব্যর্থতায় ধবধবে।'[৭] ভাই অর্থাৎ মুকুলের কাছে—'কিশোরীর মত দুপুরটা ধীরে ধীরে ফুলে উঠেছে, ভরে উঠেছে। খুব চেনা, অথচ রহস্যময়। সুন্দর।'[৮] এই ভাবেই যে যার নিজের মত করে দুপুরকে দেখছে। এবং তাদের ভাবনাকে একটি সুতোয় মালা গেঁথে দিয়েছে দুপুর ও তার পটে একটি মাটির বেহালার সুর। বেহালার করুণ সুরই দুপুরকে আরও প্রতীয়মান করে তুলেছে। আসলে আমাদের না পাওয়ার বেদনা, অবচেতন বা কল্পনায় ভিড় করে আসে। এ গল্পেও যেন ঠিক সেটিই ঘটেছে। গল্পে মাটির বেহালার সুর এক অন্য রহস্যময় কল্পনার

দরজা খুলে দেয়। দেবেশ রায়ের সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্যায়ের স্বাক্ষর বহন করে 'দুপুর' গল্পটি। এই গল্পেই তাঁর ভবিষ্যৎ গল্পকার জীবনের আভাস পাওয়া যায়। গল্পটিতে তিনি পাঁচটি চরিত্রের সূত্রে একটি কম্পোজিট ইমেজ তৈরি করেছেন। লেখার ধরণ ও বিষয় নির্বাচনে এই গল্পটি কোথাও যেন কিছুটা যান্ত্রিক হয়ে গেছে। প্রতিটি চরিত্রই আলস্যময় এক দুপুরে অতীত, স্মৃতি চারণায় ও কল্পনায় এক ঘেয়েমির বাতাবরণ তৈরি করেছেন। তাতে সাধারণ পাঠকের কাছে রসাস্বাদন করতে কিছুটা অসুবিধা মনে হতে পারে। কিন্তু তিনি সেই সময় থেকেই বিষয় ও কথনরীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে হাঁটতে শুরু করেছেন। বাস্তবিক একই বিষয় নিয়ে বারবার পরীক্ষা করার প্রবণতা দেবেশ রায়ের আছে। এবং প্রতিবারেই সেই বিষয়কে নতুন করে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেন। আর সেই কারণেই প্রায় একই বিষয় নিয়েই পরবর্তীকালে লেখেন—'স্মৃতিজীবী' ('দেশ', ১৯৫৮)। গল্পটি যেন 'দুপুর' গল্পেরই স্মৃতিবাহী একটি গল্প। পাঁচটি যুবকের স্মৃতিচারণা—দুপুর নিবিড় হবার সঙ্গে সঙ্গে জমে উঠল। গল্পকার জানাচ্ছে—স্মৃতি এমন একটা কক্ষ, প্রবেশমাত্র একটা তীব্র সুবাসে দেহ আচ্ছন্ন হয়ে যায়, সৌরভের উৎসটিকে দেখা যায় না। কিংবা তিনি লিখছেন—ঘরটায় দুপুর এসেছে। যে-যার বিছানায় নানা ভঙ্গিতে শুয়ে আছে।... ঘুম যেন ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত এসেছে, ভেতরে আসতে চাইছে না। কেমন এক অদ্ভুদ রাজ্যে সব মনগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে রাজ্যগুলো যেন ঘুমের দেশের চারপাশে। ভেতরে ঢুকবার আগে এইসব রাজ্যেই তারা থেকে যাচ্ছে। যেন কুয়াশা দিয়ে আঁকা, কিংবা শীতের রাতের নিঃশ্বাস দিয়ে। চরিত্রগুলো স্মৃতিচারণায় এই চিন্তাই করেছে—'সে দিনগুলো ছিল, নেই, আসবে না।'

'দুপুর' গল্পের পর দেবেশ রায়ের স্মরণীয় গল্প 'পা' ১৯৫৮ 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গল্পটি একটি নারীর পরিপ্রেক্ষিতই ব্যবহৃত। বাড়ির বড় বৌ ও ছোট বৌ আত্মহত্যা করতে গিয়েছে। বড় বৌ আত্মহত্যা করলেও ছোট বৌ আত্মহত্যা করতে গিয়ে একটি পা হারিয়ে বসে। তারপর নিজের সঙ্গে, পরিবারের সঙেগ তার সামঞ্জস্য ঘটানোর প্রাণান্তকর, বিচিত্র প্রয়াস—দু-পাওয়ালা মানুষের মতো ব্যবহারের জন্য তৃষ্ণা—এই গল্পের বিষয়বস্তু। ছোট বৌ -এর অনেক সময় মনে হয়েছে সে মরণেরও নয় জীবনেরও নয়। কী কারণে সে মরতে গিয়েছিল, তা সে ভুলে গেছে। কিন্তু মরতে গিয়ে যে একটা পা খুইয়ে ফিরে এসেছে,

তা সে ভুলতে পারল না। কেউ ভোলে নি। এখন মরতে না পারলে সে বাঁচবে না। ছোট বৌ-এর ভাবনা - বড় বৌ মরে বেঁচেছে আর সে যেন বেঁচে প্রতিনয়তই মরছে। তাই সে দ্বিতীয়বার আত্মহত্যা করতে গিয়েও করতে পারেনি। গল্পকার লিখছেন—

> ''প্রতিটি মুহূর্তে এক-একটা বিরাট বিরাট পাহাড় হয়ে ছোট বৌয়ের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। ছোট বৌ সহজ ও স্বাভাবিক হতে পারছে না। ছোট বৌয়ের আশঙ্কা হচ্ছে—আর পারবে না।''[৯]

ছোট বৌ দেখেছে মানুষ নানাভাবে হাঁটে। একজনের হাঁটার সঙ্গে আর একজনের হাঁটার কোন মিল নেই। হাঁটায় মানুষের লজ্জা-রাগ-অভিমান-ছলনা সবই প্রকাশ করা যায়। এখন সবাই পারে কিন্তু সে পারে না। আত্মহত্যা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে সে পরিবার-সমাজের চোখে অন্য চোখে দেখার পাত্র হয়েছে তাই নয়, নিজের কাছেও তা সে ভুলতে পারে না সেই যন্ত্রণা। শারীরিক প্রতিবন্ধকতাই তা স্মরণ করায়। গল্পে ছোট বৌ-এর বিচ্ছিন্ন চিন্তাই বিধৃত। ছোট বৌ যে কোন সময় যে কোন সমাজের চরিত্র হতে পারে। সমাজের দু-পাওয়ালা মানুষদের সামাজিক সত্তা কর্ম বিন্যাসই ধরা পড়েছে ছোটগল্পের পা হারানোর ঘটনায়। গল্পটির শেষ লাইন— 'এক বছর পর ছোট বৌয়ের একটা দু-পাঅলা বাচ্চা হল।'[১০] জীবনের প্রতি একটি সুস্থবোধ এই গল্পে উপস্থিত। এই সুস্থতা, বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধা, বিষয় সম্পর্কে সচেতনা গোড়া থেকেই দেবেশ রায়ের মধ্যে সক্রিয়। প্রথম খণ্ডের 'হাড়কাটা', 'দুপুর', 'স্মৃতিজীবী', 'পা' এই গল্পগুলিতে তিনি সমাজের নানা চিত্র বিভিন্ন ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন। কিন্তু যে লক্ষ্যভেদী শ্রেণিবল ও সমাজ ইতিহাসবোধ দেবেশ রায়ের ভাবনা চিন্তায় কার্যশীল। এই গল্পগুলিতে তা এখনও অবধি অনুপস্থিত। বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধা, সচেতন লেখক এই দেশকাল নিরপেক্ষ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির চিন্তাচর্চা বেশিদিন করলেন না। 'পরিচয়' পত্রিকায় ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয় একটি অন্যতম গল্প 'কলকাতা ও গোপাল'। গোপাল পুরোপুরি একটা সামন্ততান্ত্রিক পরিবারের ছেলে অথচ কলকাতার নাগরিকতায় সে লালিত। তার সমস্যা শুধু বেকারত্ব নয়, আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-ধনতান্ত্রিক নগরি কলকাতা গোপালকে জীবন সম্পর্কে কোন বিশ্বাসেই বিশ্বাসী হতে দেয় নি। এখানে একই সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক ধারণা মানুষকে প্রেরণা দেয়, ধনতান্ত্রিক কারণে মানুষ আত্মহত্যা করে, আবার

সমাজতন্ত্রের শেষতম বাণী মানুষকে উদ্দীপিত করে। 'কলকাতা ও গোপাল' সম্পর্কে গল্পকারের এই বিশ্লেষণ থেকেই প্রমাণ মেলে—এই গল্প থেকেই দেশ-কাল-শ্রেণি বোধ পূর্ণমাত্রায় সক্রিয় হতে শুরু করেছে তাঁর গল্পে। গল্পটি কেবলমাত্র একটি উদ্দেশ্যহীন, নীতিহীন, উদ্যমহীন, সংগ্রামহীন আত্মহত্যার কাহিনি নয়। দারিদ্র বা বেকারত্ব যে একটা সামাজিক সমস্যা তা এই গল্পের ছত্রে ছত্রে বিধৃত। সমাজ, সামাজিক সম্পর্ক, পরিবেশ জড়িয়ে মানুষের অন্বেষণের সূত্রেই বর্তমান বাস্তবকে রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টাই গল্পকারের মূলকথা। গোপালের আত্মহত্যার পূর্বের কিছু সময় গল্পের বিষয়বস্তু। 'পা' গল্পে যেমন আত্মহত্যার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে তেমনি 'কলকাতা ও গোপাল' এই গল্পেও এক শিক্ষিত বেকার যুবকের আত্মহত্যার কথা রয়েছে। এই আত্মহত্যা করার অনিবার্যতা দেখিয়ে দেয় 'পা' গল্প থেকে 'কলকাতা ও গোপাল' -এ দেবেশ রায়ের বিবর্তন অনেকখানি। দেবেশ রায়ের গল্পকার সত্তার বিকাশ ও বিবর্তনের ক্ষেত্রে 'কলকাতা ও গোপাল' গল্পের মূল্য অপরিসীম।

দেবেশ রায়ের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য গল্প—'পশ্চাৎভূমি'। এই গল্পের মূল বক্তব্য—কলকাতা সমুদ্রের নিকটে ভাগীরথী তীরস্থিত একটি বন্দর-আসাম, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রবেশ, মধ্যপ্রদেশ তার পশ্চাৎভূমি জীবন আবেগে ভরপুর, মানুষের সুস্থ আশার গল্প এটি। 'কলকাতা ও গোপাল' গল্পে কলকাতায় বাস করেও এক যুবক নগরি কলকাতার সাধারণ মানুষ হতে পারেনি 'পশ্চাৎভূমি' গল্পের কুশীলবরা কিন্তু কলকাতার দূরে বাস করেও কলকাতার আহ্বান শুনল, তাদের মনে হয়েছে এই বন্দরে পৌঁছাতে পারলেই যেন জীবনের রস আস্বাদন করা যেতে পারে। 'আমি ছবি আঁকব, আমি গান গাইব, আমি হাতে ব্যাট নিয়ে দু-পায়ের উপর নাচব; আমি সমুদ্র দেখব'—কলকাতা থেকে দূরে বসে সকলের এই আশা কিন্তু কলকাতামুখী। কলকাতা এদের সকলের কাছে এক সমুদ্রের আহ্বান। 'কলকাতা ও গোপাল' গল্পে যেটা প্রচ্ছন্ন ছিল, 'পশ্চাৎভূমিতে সেটা স্পষ্ট হল—কলকাতা এক প্রতীকের মর্যাদা পেল।

সমসাময়িক দেশ কালের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে বিশ্বজনীন হওয়ার প্রচেষ্টা দেবেশ রায়ের মধ্যে বরাবরই ছিল। প্রথম খণ্ডের 'দুপুর' কিংবা 'পা' এই গল্পগুলির মধ্যে যেমন দেশ-কাল নিরপেক্ষতা কার্যকর তেমনি পরবর্তী গল্পগুলিতে ধীরে ধীরে তিনি তা কাটিয়ে

উঠে বিষয় পরীক্ষায় বা কাহিনি বিন্যাসে তার একটি সামগ্রিক বা বিশ্বজনীন রূপ দিতে সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি গল্পে যেমন দেশ-কাল-সমাজ-পরিবেশের শুদ্ধ বাস্তবকে তুলে ধরেছেন তেমনি দেশ-কালের সীমা ছাড়িয়ে গল্পের বিষয়কেই প্রতীক করে তুলেছেন, রূপকে ধরতে চেয়েছে বাস্তব সমাজের নানা চিত্র। তাঁর গল্পে শ্রেণি বোধের কথা উঠে এলেও শ্রেণিচেতনার ভ্রান্তি ও সরলীকরণকে তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন। 'নিরস্ত্রীকরণ কেন?'—এই গল্পের শুরুতেই তিনি লিখছেন—

> ''পরস্পর সংলগ্ন ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন রেললাইন। একটি রেললাইনের বর্ণনার মধ্যদিয়েই তিনি যেন গল্পের মূল সুরটি বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন যেখানে মানুষে মানুষের আত্মিক নৈকট্য ও বিশ্বাসহীনতার কথা। একটি ট্রেনের থ্রু-কোচ যাকে দূর মফঃস্বল লোকাল গাড়ির সঙ্গে কলকাতায় যাবার জন্য জুড়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেই কোচের ভিতর বিভিন্ন শ্রেণী ও টাইপের কয়েকজন যাত্রী। সেখানে অতীত ও ভবিষ্যৎ সব কিছু মিলিয়ে নিজেদের বৃহত্তর কোন শক্তির কবলিত আত্ম স্বাতন্ত্র্যহীন বলে হয়। এই অধীনতাবোধ এই ট্রেনের যাত্রীদের কুল লক্ষণ।''[১২]

অর্থাৎ বিশ শতকের মধ্যভাগে ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্বের মানুষেরই বৃহত্তর শক্তির নিকট অসহায়তা কিংবা অধীনতা বোধের চিত্রই যেন গল্পকার এই গল্পের বিষয়ের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরলেন। ট্রেনের যাত্রীদের কথোপকথনে উঠে আসে বর্তমান সময়ের আত্মিক সংকটের ছবি। একটি স্টেশন থেকে চোর ওঠা শুরু হয়—এই খবরটি শোনার সঙ্গে সঙ্গেই কামরার যাত্রীরা কোন এক বৃহত্তর শক্তির অধীনতাবোধে আচ্ছন্ন ও আতঙ্কিত হয়ে উঠছে। আতঙ্কিত যাত্রীদের নিয়েই ট্রেন ছুটে চলেছে তার নিজস্ব গন্তব্যে। চলন্ত ট্রেনের দরজায় সজোরে আঘাত হানছে বৃহত্তর শক্তি তা কখনও অনুণয়ের সুরে প্রার্থনা জানালেও যাত্রীদের কাছে তা ছলনার আশ্রয় নিসেবেই মনে হয়েছে। কেননা, সেই অনুণয় আকুতির সুর মুহূর্তেই গর্জে ওঠে হুঙ্কারে।— ''কিছুক্ষণ পরেই দরজায় সেই অমোঘ শব্দ যে শব্দে শতাব্দীর নাম, বৎসরের নাম, আর গ্রহের নাম মনে করিয়ে দেয়। প্রথমে খুব আস্তে আস্তে দু-বার, আর যেন প্রায় আদেশের মতো দরজাটা খুলুন।''[১৩] চোরের ভয়ে কামরার দরজা জানলা সবই বন্ধ—আর

দরজায় ঝুলে একটি মানুষ প্রাণপনে বন্ধ দরজা খুলতে চাইছে। তার পরেই কামরা জুড়ে শুরু হল তীব্র নাটক। যাত্রী চারজন যুবক দরজা খোলার অনুরোধ জানালে সবাই তাদেরকেও অজ্ঞাত সেই ডাকাত দলের সদস্য ভাবতে শুরু করে। দরজা খোলা নিয়ে যাত্রী দু-দলের টানাপোড়নে সন্দেহ, আত্মস্বতন্ত্রতায় ও আত্মসংকটময়তায় পরের স্টেশনে দরজা খুলে কিন্তু কাউকে পাওয়া যায়নি। অজ্ঞাত পরিচিত মানুষটির আদেশ, হুঙ্কার ও আর্তনাদ ট্রেনের চাকার শব্দের সঙ্গে কোথাও যেন বিলীন হয়ে গিয়েছে। সেই মানুষটির দরজা খোলার আর্তনাদের সঙ্গে বাস্তবিক এই ভাবেই তো জীবন আমাদের আর্তনাদ করে বলছে দরজা খুলুন। বিশ শতকের ষাটের দশকে জীবন পৃথিবীর মানুষের কাছে এই ভাবেই তো প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছে। কিন্তু মানুষ প্রায় নিরুপায়। কামরার চারজন যুবকই নিজেদের ভেতর দিকে তাকিয়ে চিন্তা করেছে— ''আত্মরক্ষা করার মৌলিক অধিকার খাটাতে গিয়ে, মৃত্যুকে হটাবার মৌলিক মানবিক অধিকারকে কি দরজার বাইরে ফেলে দেওয়া হল!''[১৪] গল্পকার এই গল্পের শেষে সমকালীন সমাজ বাস্তবতায় প্রেক্ষিতে জীবন জিজ্ঞাসার কতগুলি প্রশ্ন করেছেন—

> ''এই সঙ্কীর্ণ কাঠের দরজায়কে আঘাত করছে? হত্যা না মৃত্যু? এই চার যুবক কোন দলের? মারবার না বাঁচাবার? এই চার মানুষ কী চায়? মারতে না বাঁচাতে? জীবন কি এই কামরায় নারী আর শিশুতে কাঁদছে, নাকি বাইরে হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলছে? এটা কী বাঁচা না মারা? ট্রেন এই বাষ্পচালিত মহান যন্ত্র, কামরার ভেতরের লোকগুলোকে বাঁচাচ্ছে, নাকি বাইরের লোকটাকে মারছে? সঙ্গমরত দুই সাপের মত বিচিত্র জটিল বন্ধনীতে অশ্লিষ্ট এই দুই প্রশ্নের আলাদা দেহ চেনা যায় না।''[১৫]

পৃথিবী সম্পর্কেও এই প্রশ্ন। সর্বকালে সর্বমানবের জীবনরক্ষা, মানুষকে বাঁচার অধিকারে প্রতিষ্ঠা করাই কাজ আত্মরক্ষাই কিন্তু বড় কথা নয়। এখানে স্বভাবতই মনে পড়ে কবিগুরুর সেই অমোঘ বাণী 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ' গল্পে যাত্রীদের আত্মিক সংকট মমতার চিত্রে তুলে ধরেছেন সামাজিক মানবসভ্যতার সংকটময়তার কথা। এখানে চলন্ত ট্রেন রূপকে কালকেই চিহ্নিত করেছে। গল্পের শেষ প্রশ্নগুলিতে আত্মপ্রতিষ্ঠা কিংবা আত্মরক্ষাই

বড় হয়ে ওঠেনি। তাইতো নিজ দেশের জন্য সমরায়োজন নয়, সার্বিক নিরস্ত্রীকরই চাই। সনাতন মানুষের গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্যই। গল্পের শেষে লেখক জানিয়েছেন—

> ''ঘন্টার পর ঘন্টা অন্ধকারে থেকে যারা শেষে একটা বড় গাড়ির সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে পথে বেরিয়েছিল, তারা আত্মরক্ষার আরাম ও স্বস্তি এবং হত্যাকারীর বিষাদ ও গ্লানিতে আর এক মানুষ হয়ে গন্তব্যে পৌঁছেছিল। কিন্তু মানুষগুলিই বদলে যাওয়ায় গন্তব্য আর স্থির থাকেনি।''[১৬]

বই গল্পটিতে গল্পকার সমাজ বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বিষয় নির্বাচন করে তাকে বিশ্ব জনীনতায় উর্ত্তীণ করতে সমর্থ হয়েছে।

১৯৬২-তে লেখা দেবেশ রায়ের আর একটি অন্যতম গল্প 'উদ্বাস্তু'-এর বিষয়বস্তু—

> ''১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে পৃথিবীর ভূগোল ও ইতিহাসে যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে, তার একটি সুসম্পাদিত ও সুসংগৃহীত তালিকা না-থাকায়, পৃথিবীর আধিবাসীদের দেশ, জাতি, ভাষা, বংশ ইত্যাদি চিহ্নিত করার কিছু ব্যাঘাত ঘটেছে। সব দেশের ভূগোল ও ইতিহাস এত গুরুতর পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছে যে, কে যে কে, সে বিষয়ে স্থির নিশ্চিত জানার উপায় নেই।''[১৭]

ইতিহাসের গতিতে পরিচয় হারা ব্যক্তি মানুষের আত্মিক ও বাহ্যিক উভয় দিকের আত্ম সংশয়ের ছবিই ফুটে উঠেছে এই গল্পে। সত্যিই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে মানব সভ্যতায় আত্মপরিচয়ের সংশয়াত্মক ও সংকটময়তা এমনভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে যেখানে মানুষ সমাজে বসবাসকারী অন্য আর একজন মানুষকে সব সময় কেবল সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেছে। প্রত্যেকেই যেন নিজ বাসভূমে 'উদ্বাস্তু' গল্পে সত্যব্রত ও অণিমা ভারতবর্ষের উদ্বাস্তু মানুষের কেবল প্রতীক মাত্র। সত্যব্রতকে নিকটবর্তী থানায় হাজিরা দিয়ে প্রমাণ করতে হয়েছে সেই আসল সত্যব্রত। 'নিরস্ত্রীকরণ কেন?' গল্পে সনাতন মানুষ সন্দেহের কারণ বশত তাদের মানবিক সত্তাকে হারিয়েছে। এই ভয়ঙ্কর শতাব্দীর সামনে অবনত; অতীত থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন, অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে উর্দ্ধমুখী মানুষ নিরুপায়, বিধ্বস্তু। কিন্তু এই গল্পে অন্ধকার ভবিষ্যতের ঘোষণা আরও ভয়ঙ্কর—ব্যক্তির নিজেকেই মনে হয়েছে—''তুমি তুমি নও

সত্যব্রত, তুমি তুমি নও অণিমা।''[১৮] সমকালীন কিংবা বর্তমান সময়েও মানুষ তার বাহ্যিক পরিবেশ, সমাজ সত্তার প্রতি বিশ্বাস বোধের সামান্য আস্থাটুকুও ভেঙ্গে ফেলেছে। মানুষের বাহ্যিক সত্তা ক্রমশ ভাঙতে ভাঙতে শেষে এমন একটা পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, ভাঙন শুরু হয়েছে নিজের আত্ম-আত্মিককতায় যেখানে সে সম্পূর্ণ একা, নিজের কাছেই নিজের সত্তার প্রমাণ দিতে হয়েছে বারবার, সেখানে নিজের আপন জনের ধারণাই আপেক্ষিক। সম্পর্কের এই আপেক্ষিকতার কথাও গল্পে উঠে এসেছে—

> ''ততদিনে যাঁকে আপনি স্ত্রী বলে জানেন, তিনি আপনার স্ত্রী নন; যাকে আপনাদের সন্তান বলে জানেন, সে আপনাদের সন্তান নয়। সুতরাং নিজের আদি, অকৃত্রিম ও মৌলিক আত্মপরিচয়সহ নিকটবর্তী থানায় হাজিরা দিয়ে প্রমাণ করুণ আপনি যে, আপনি সত্যিই সে।''[১৯]

সূর্যাস্তের পর পৃথিবীর একাংশ যেমন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায় তেমনি আর এক অংশে তখন প্রকৃতির আলোক ছটা, দেবেশ রায়ের যথার্থ ইতিহাসবোধ, যে ইতিহাসবোধ শুধুমাত্র ধ্বংস কিংবা নিরাশার বাণী শোনায় না অন্ধকার রাত্রির শেষে আলোকছটার জন্যেও অপেক্ষামান, সেই ইতিহাসবোধ ও মানসভ্যতার প্রতি বিশ্বাস রেখেই আবেগ কম্পিত হয়ে গল্পের শেষ ছত্রে লেখেন—''বাইরে কচি করুণ একা কণ্ঠে তীরের মত তীব্রস্বরে অন্ধকারকে ভেদ করে অঞ্জু তাদের আত্মার তর্পণের মন্ত্র হাঁকবে : 'বাবা' 'মা'—তারই অপেক্ষায়।''[২০] এখানেই দেবেশ রায়ের গল্পের সার্থকতা। 'উদ্বাস্তু' কিংবা 'নিরস্ত্রীকরণ কেন?' গল্পে দেবেশ রায় রূপকের আশ্রয়ে, প্রতীকি ব্যঞ্জনায় তুলে ধরেছেন সমাজ বাস্তবতা। এই প্রতীকের আশ্রয়ে পরবর্তীতে তিনি লিখলেন 'অপভাবনা' কিংবা 'রঞ্জুর রক্ত'। দুটি গল্পই লেখেন ১৯৬৪ সালে। 'অপভাবনা' গল্পের শুরুতেই উনিশ বছরের একটি মেয়ে সন্তান হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে আছে—তার সন্তান প্রসব করার সময় হয়েছে, কিন্তু তার প্রসব বেদনা উঠছে না। তাই ইনডাকসন করতে হচ্ছে। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে শুয়ে তার ভাবনায় আসছে নানা ভাবনা—তার স্বামীর কথা, শ্বশুরবাড়ীর কথা। মেয়েটির ভাবনার কথা বলতে গিয়ে লেখক ক্রমশ কলকাতা, ভারতবর্ষ, পৃথিবী নামক এই গ্রহের চিত্র তুলে এনেছেন তাঁর গল্পে, উনিশ বছরের এই অন্তঃসত্ত্বা নারীই যেন পৃথিবী। কেউ জানেনা তার গর্ভে ঘটোৎকচ না

অভিমন্যু। ধীরে ধীরে মেয়েটির পেটে ক্ষীণ ব্যথা দেখা দিল। কিন্তু সেই ব্যথাও ক্রমশ বিলীয়মান। ডাক্তার মেয়েটির পরীক্ষা করে চলে গেলেন। এবং মেয়েটি জানতেও পারল না তার গর্ভে মৃত সন্তান, সে ডেলিভারি টেবিলে যাচ্ছে মৃত সন্তান প্রসব করার জন্যে। গল্পের শেষ লাইনে গল্পকার লিখছেন—'কলকাতার আকাশের নক্ষত্ররাজিতে তখন অরাজকতা।'[২১] স্বল্পায়তন বিশিষ্ট এই গল্পটিকে লেখক শুধুমাত্র চরিত্রের ইমেজে নয়, বাস্তবিক দৃঢ়বদ্ধতায়, একটি কবিতার ন্যায় প্রতীক করে তুলেছেন। তেমনি আর একটি প্রতীক ধর্মী গল্প 'রঞ্জুর রক্ত'। ১৯৬৪-তে লেখা এই গল্প রঞ্জু নামক এক প্রাণময় কিশোরের কাহিনি—

> ''আঠার বছরের রঞ্জুর স্বভাব জান্তব। রঞ্জু যখন হাসে হা হা করে দু-হাত দু-পা ছড়িয়ে পাশের লোককে ঘায়েল করে হাসে। রঞ্জু যখন কাঁদে উঠোনের মধ্যে কাটা পাঁঠার মত দাঁপিয়ে কাঁদে। পড়াশুনায় রঞ্জু প্রায় বাল্মীকি মুনি, সোজা রাম নামও উচ্চারণ করতে পারে না। এখন উল্টোদিক থেকে মরা-মরা বলে যদি কিছু হয়। রঞ্জুর ক্ষুৎ-পিপাসা গড়পড়তার চেয়ে কিছু বেশি।''[২২]

অকালেই বিলীন হয়ে যায় প্রাণময় এই কিশোরের জীবনের ক্ষুধা-পিপাসা-রূপ-রস-রং। রঞ্জুর মুখ দিয়ে একদিন রক্ত উঠল। সে বিছানা বন্দী হয়ে ক্রমশ ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে। রঞ্জুর জীবন বিদায়ের সময়—''পানের জল নিয়ে মা দুয়ারে, থমকে, রঞ্জুর চৌকির চারপাশে দোয়েলের রঙের মত রক্ত, সেই বৈকালের চুম্বনের স্বাদ এখনো ঠোঁটে, রঞ্জুর, রঞ্জুর শরীরের সবটুকু রক্ত যেন উগরে দিচ্ছে, আর মা দুয়ারে, হাতে রঞ্জুর পিপাসার জল—সবটুকু পিপাসা রঞ্জু বমি করে ঢেলে দিচ্ছে।''২৩ গল্পের এই কাহিনিকে কোন ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যায়িত করা যায়? যেখানে সন্তানের পিপাসার জল নিয়ে দাঁড়িয়ে মা। গল্পকার এই গল্পে জীবনের চরম সত্যটি উপলব্ধি করতে পেরেছেন। যেখানে আমাদের প্রত্যেকেরই একটি স্বতন্ত্র্য স্বদেশ রয়েছে, যেখানে আমরা প্রত্যেকেই এক-একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের স্বাধীন বাসিন্দা। গল্পের শেষ অনুচ্ছেদে লেখক বলেন—''এক শকুন এসে বসল রঞ্জুর শিয়রে, দুই পাখার বিস্তারে মায়ের দৃষ্টি থেকে রঞ্জুকে আড়াল করে আর তরঙ্গ মথিত সমুদ্রে বেহুলাহীন লখিন্দরের মত ভাসে রঞ্জু—আহার নিদ্রা চুম্বনের তটভূমি থেকে, বিচ্ছিন্ন তার স্বদেশের মত।''[২৪] গল্পে রঞ্জুর মৃত্যু

ও মায়ের বেদনার সামনে দাঁড়িয়ে বর্তমান সময়েও আমরা, স্তব্ধ, চিত্রবৎ।—এখানেই দেবেশ রায়ের গল্পকার সত্তার যথার্থ স্বাক্ষর।

এই আলোচনায় একটি বিষয় স্পষ্ট যে 'হাড়কাটা' গল্প থেকে আরম্ভ করে 'রঞ্জুর রক্ত' পর্যন্ত দেবেশ রায়ের গল্পের ক্রমবিবর্তনের পথ অনেকখানি। বিভিন্ন বিষয়বৈচিত্র্যতা তাঁর গল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। প্রায় একই বিষয়কে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার প্রবণতা দেবেশ রায়ের মধ্যে আদ্যপান্তই ছিল। সমকালীন সমাজের অতি সামান্য ঘটনাকে তাঁর গল্পের বিষয় হিসাবে নির্বাচন করেছেন বটে। কিন্তু তার সঙ্গে তিনি আপন শিল্পী সত্তার রসায়ণ ঘটিয়ে সামান্য থেকে সার্বিক বা সর্বজনীন করে তুলেছেন।

দেবেশ রায়ের 'গল্পসমগ্র' তৃতীয় খণ্ডের গল্পগুলির রচনাকাল ১৯৬৮ থেকে ১৯৭৭ সাল। বিশ শতকের সত্তরের দশক দেবেশ রায়ের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ সময়। তাঁর সম্পর্কে আমরা সকলেই জানি যে তিনি একাধারে যেমন সাহিত্যিক পাশাপাশি অধ্যাপক, সাংবাদিক এবং কমিউনিস্ট পার্টির একজন একনিষ্ঠ কর্মী। তাঁর গল্পসমগ্রের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের গল্পগুলিতে রাজনীতির প্রসঙ্গ তেমন সরাসরি ভাবে উঠে আসেনি। কিন্তু তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকা অংশেই তিনি আভাস দিয়েছেন এই খণ্ডের গল্পগুলি সম্পর্কে। ১৯৬৭ সালের নির্বাচন পশ্চিমবাংলার বামপন্থীদের কিছুটা ক্ষমতার স্বাদ এনে দিয়েছিল। তেমনি নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলন ক্রমশ নাগরিক যুব আন্দোলনে পরিণত হয়ে যাচ্ছিল। এবং এই উত্তাল রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে একজন পার্টির সক্রিয় কর্মী হিসেবে তাঁর মধ্যেও সৃষ্টি হয়েছিল নানান দোলাচলতা। মূলতঃ এই রাজনৈতিক ডামাডোল পরিস্থিতিতেই তিনি তৃতীয় খণ্ডের গল্পগুলি রচনা করলেন। সেই সময় থেকেই তিনি গল্প লেখার পাশাপাশি—'মানুষ খুন করে কেন', 'যযাতি', 'বেঁচে বততে থাকা', 'আপাতত শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে' কিংবা 'মফঃস্বলি বৃত্তান্ত' এই উপন্যাসগুলি একটার পর একটা রচনা করেছেন। যদিও এই সব উপন্যাস বই আকারে বেরিয়েছে অনেক পরে। সমকালীন রাজ্য রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং তাঁর উপন্যাস লেখার প্রতি ঝুঁকে যাওয়া এই দুই কারণে দেবেশ রায়ের তৃতীয় খণ্ডের গল্পগুলির গুরুত্ব অনেক বেশি। এই সময়ের গল্পগুলিতে রাজনীতি একটি নির্দিষ্ট ফর্ম হিসেবে উঠে এসেছে। তৃতীয় খণ্ডের প্রথম গল্পটি হল 'রাষ্ট্রপতির শাসনে' ১৯৬৮-তে লেখা এই

গল্পটির বিষয় একটু ভিন্ন ধরণের। নিবারণবাবু নিশ্চয়তা বিধানের আশ্বাস বেচেন অর্থাৎ তার বীমার ব্যবসা। তার বাড়ির সোকপিটে একটি মানুষ বসে আছে কিন্তু সে জীবন্ত নয় মৃত। সেই মানুষটির আত্মহত্যা বা খুনের কারণ কি, কেনই বা তাকে খুন হতে হয়েছে, তাই গল্পের বিষয়বস্তু। সমকালীন সময়ে সমগ্র রাজ্যে গুপ্তহত্যা লীলায় মেতে উঠেছে। তার কারণ আবশ্যই রাজনৈতিক ডামাডোল পরিস্থিতি—এই প্রেক্ষাপটেই গল্পটি রচিত। গল্পের শেষ অনুচ্ছেদে গল্পকার প্রশ্নের ঢঙে জানিয়েছেন যে আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতে কি তাহলে একটা করে মৃতদেহ পাওয়া যাবে; কিংবা আমরা কি প্রত্যেকেই মৃতদেহ, নাকি আমরা প্রত্যেকেই খুনী? এই কথাগুলির মধ্যে তিনি সেই সময়ের সমাজবাস্তবতার চিত্র যেমন তুলে ধরেছেন তেমনি বর্তমান সময়ের সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা ও মানবিক সত্তার কাছে নৈতিকতার উত্তরটিও জানতে চেয়েছেন। মানুষের প্রতি মানুষের অবিশ্বাস সন্দেহ প্রবণতা তা থেকেই কিন্তু ধীরে ধীরে জন্ম নেয় গুপ্ত চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র এবং শেষে হত্যা কিংবা আত্মহত্যা। তাই গল্পকার শেষ লাইনে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—''আমাকে একটু সময় দিন। নইলে আমি প্রমাণ করে বসতে পারি যে স্বয়ং রাষ্ট্রপতির শাসনাধীন পবিত্র ভারতীয় সংবিধানের অধীনে আমরা প্রত্যেকেই মৃতদেহ ও প্রত্যেকেই খুনী।''[২৫]

তৃতীয় খণ্ডের একটি অন্যতম গল্প 'মানুষ রতন'। ১৯৭১ সালে লেখা এই গল্পটির প্রেক্ষাপট রাজনীতি। 'রাষ্ট্রপতি শাসনে' গল্পে যেমন একটি মৃত্যু সমসাময়িক সময়ের শত শত মৃত্যুর প্রতীকে প্রতীয়মান হয়ে ওঠে তেমনি এই গল্পেও উঠে এসেছে মৃত্যুর প্রসঙ্গ যার অভ্যন্তরে প্রোথিত রয়েছে রাজনৈতিক দলাদলি। এই গল্পে কেবলমাত্র একজনের মৃত্যু বা মৃতদেহের কথা নয় পুরো ঊনচল্লিশটি মৃতদেহের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন গল্পকার। এবং সেই মৃতদেহের সংখ্যা গণনায় তিনি বলছেন এক নং থানায় সাড়ে বাইশ ও দুই নং থানায় সাড়ে ষোল মোট ঊনচল্লিশটি। এই রকম পরিস্থিতি হওয়ার কারণটাও খুবই চমৎকার কেননা সেই সময় রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্তা এমন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে যাকে কোন অঞ্চলের রক্ষকের দায়িত্ব ভার দেওয়া হয়েছিল তিনিই হয়ে উঠেছেন ঐ এলাকার ভক্ষক। কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকে নিজের নিজের অংশটুকু নিয়েই ব্যস্ত। গল্পের প্রতিটি অনুচ্ছেদে বারংবার ফিরে এসেছে একটি-দুটি কয়েকটি মৃতদেহের প্রসঙ্গ, পথে-ঘাটে-মাঠে ছড়িয়ে

ছিটিয়ে যে মৃতদেহগুলি পাওয়ার কথা জানা যায় তারা কি পালাতে গিয়ে মরে ছিল নাকি মারতে এসে মৃত্যুর সঙ্গে আলিঙ্গন করেছিল তা বোঝার উপায় নেই। কেননা, সেই সময় যুদ্ধ ও আত্মরক্ষা একাকার হয়ে গিয়েছে। গল্পের শেষ লাইনে লেখকের বক্তব্য এমন যে— 'আপাতত মানুষের মাথা বাঁচানোর জন্যই মানুষের মাথা কাটা দরকার।' খুবই চমৎকার একটি স্ববিরোধী মন্তব্যে গল্পের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। সত্যিই তো সমকালীন সামাজিক পরিস্থিতিতে নিজের আত্মরক্ষার স্বার্থে অনেক মানুষকে যুদ্ধে নামতে হয়েছে, এই লড়াই সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লড়াই। সেই লড়াইয়ে কেউ মেরেছে কেউ মরেছে। সমাজ বাস্তবতার এই চিত্রটি খুবই নিপুণভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন দেবেশ রায়। সমাজকে চেনার এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিই সমকালীন বাংলা গল্পকারদের থেকে তাঁকে সহজেই চিনে নিতে সাহায্য করে।

১৯৭৪ সালে লেখা দেবেশ রায়ের একটি অন্যতম গল্প 'কয়েদখানা'। সত্তরের দশকের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে লেখা এই গল্পটির কাহিনি। গল্পের শুরুতে সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় পাশাপাশি দুই সংবাদের উল্লেখ রয়েছে। প্রথমটি সুপ্রিমকোর্ট মিশা আইনের ১৭ক ধারা বাতিল করে দিয়েছেন। দ্বিতীয়টি আবার জেল ভাঙা, আবার সন্ত্রাস। যা দেখে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য—''এই জেল ভাঙার ঘটনাতেই প্রমাণ হচ্ছে ১৭ক ধারার মত বা নিবর্তনমূলক আটক আইনের মত একটি আইন কত জরুরী।''[২৬] যা দেখে যুব নেতার মন্তব্য সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি আদালত স্তব্ধ করতে পারবে না। এই দুই নেতার মন্তব্যেই তিনি সমকালীন রাজনীতির সুর বেঁধে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে সমাজ অর্থনীতির শ্রেণি ভেদের চিত্রটিও গল্পে তুলেছেন গল্পকার। তিনি লিখছেন—

> ''জেলখানার বাইরে ও ভিতরে তফাৎটা কোথায়, একটা দেয়ালের। একটা দেয়াল ও আর সামাজিক অবস্থাটা বদলে দিতে পারে না। বাইরেও যে-সমাজ, ভিতরেও সেই সমাজ। আমরা ভদ্দর লোকের ছেলে বলে আরামে আছি আর জলিলকে কনভিক্টদের সঙ্গে রেখেছে ও আধিয়ারের ছেলে। সুতরাং জেলের বাইরে লড়াইয়ের যে কায়দা, জেলের ভিতরেও তাই।''[২৭]

এই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বাস্তবতার সমান্তরালে গল্পের চরিত্রদের এক ভাবনা গত বিপর্যয় এবং তাদের কর্ম যেন নিয়তির কাছেই আত্মসর্মপণ করতে বাধ্য হয়েছিল। কোন এক সময়ে নসু ও তার দলের লোকেরা একের পর এক হত্যায় মেতে উঠে ছিল। কেননা, তাদের কাছে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এই হত্যালীলায় অন্যতম পথ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু সেই পথের শেষে পৌঁছানোর আগেই তাদের পথ হারিয়ে যায়। তাদের বিশ্বাসে ফাটল ধরে। বুকের ভিতর সন্দেহের বীজ থেকে অঙ্কুরের সৃষ্টি হয়। জেলের গণ্ডির মধ্যে বসে তাদের প্রত্যেকের কাছেই মনে হয়েছে এই কয়েদখানা তাদের ভুলের খেসারত মাত্র। অথচ তার অনেক সিদ্ধান্তই তারা নেয়নি। জেলের দেয়ালের গাঁয়ে একটি মই থাকলেও সেখান থেকে তাদের পালানোর কোন পথ নেই, কিংবা পালিয়ে গিয়েও লাভ নেই। কোথায় বা তারা লুকিয়ে থাকবে? সমাজের বাইরে গিয়েও পালিয়ে থাকতে পারবে না। দু-চার বছর গা-ঢাকা দিয়ে থাকলেও প্রয়োজন পড়লেই রাষ্ট্রীয় শক্তি তাদের গ্রেপ্তার করবে তারপর ধরে আসার পর আবারও মাঝে মাঝে পালিয়ে যাবার জন্য মই রেখে দেওয়া হবে। এই তো আমাদের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর চিত্র। গল্পের কাহিনির সঙ্গে সম্পূর্ণ অন্বয় রেখে উঠে এসেছে ভলিবল খেলার প্রসঙ্গটি, যা শৈলী নির্মাণের ক্ষেত্রে দেবেশ রায়ের সফলতার দৃষ্টান্ত বলা যেতেই পারে। খোলার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন এক্ষেত্রে টাইমিংটাই আসল। সেই সঙ্গে বলেছেন পজিশনের কথা। সত্যিই তো শুধু কি খেলার ক্ষেত্রেই 'টাইমিং' আর 'পজিশন' গুরুত্বপূণ? বাস্তব সমাজ ব্যবস্থায়ও সময় এবং অবস্থান চরিত্রের ভাগ্য নির্ণয়ের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। গল্পকার এক্ষেত্রে ভলিবল খেলার মধ্যদিয়ে এই সত্যের উপলব্ধি করেছেন। যা কাহিনির সঙ্গে সমান্তরাল ভাবেই প্রাসঙ্গিক।

১৯৭৭ সালে লেখা 'গল্পসমগ্রে'র তৃতীয় খণ্ডের শেষ গল্প 'মূর্তির মানুষ'। গল্পটি একটি মূর্তি ও একজন মানুষের গল্প। টটাই অর্থাৎ টটেশ্বর রায় মেলায় মূর্তির মতো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এটাই তার পেশা, তাকে সঞ্চালন করে কিনু দা। কোলকাতার মেলায় উত্তরবঙ্গের মানুষ টটাইয়ের মূর্তির ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকার ঘটনা নিয়েই গল্পের কাহিনি। প্রাণবন্ত মানুষকে নিষ্প্রাণের মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে থাকা—এই প্রতীকে গল্পকার তাঁর শিল্পী সত্তার অনবদ্য পরিচয় তুলে ধরেছেন এই গল্পটিতে। মেলায় আসা সকল ব্যক্তি টটাইকে মূর্তির

মানুষ হিসেবে দেখেছেন। কিন্তু কেবলমাত্র একটি মেয়ের কাছেই টটাই মানুষ রূপের পরিচয় ধরা দিয়েছে। জীবনের তাগিদে জীবন্ত মানুষের পুতুলে পরিণত হওয়ার অনুসঙ্গ বোঝাতে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন উত্তরবাংলার লোকসংগীত ভাওয়াইয়ার বিখ্যাত গান 'আজি ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে।' জীবন যন্ত্রণার ফাঁদে পড়া আমাদের প্রত্যেকের কাছেই এই লোকসংগীতের অর্থ, নানা ব্যঞ্জনায় ধরা দেয়। টটাইয়ে মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা তার কাছে ফাঁদে আটকে থাকার মতন। সে মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেও নিজের অন্তরে খুঁজেছে মেলায় আসা সেই মেয়েটিকে যার কাছে সে মূর্তি নয় মানুষ। মেয়েটিই হয়ে উঠেছে তার কাছে আশা-আকাঙক্ষার মূর্তিয়মান মানুষ। যাকে আমরা সর্বদাই পেতে চাই, যার দিকে আমাদের নিরন্তর যাত্রা কিন্তু বাস্তব জীবন রক্ষার তাগিদ ও সামাজিক কাঠামোর বেড়ি থেকে মুক্তির কোন উপায় নেই। জীবন যন্ত্রণার এই কথাই ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে 'মূর্তির মানুষ' গল্পে।

দেবেশ রায়ের আর একটি অন্যতম গল্প 'বৃষ্টিবদল'। বৃষ্টিতে প্রকৃতির দুই রূপ প্রকাশ পায়, গল্পের শুরুতে বৃষ্টিতে প্রকৃতির দুই রূপ প্রকাশ পায়, গল্পের শুরুতে বৃষ্টিতে দুর্ভোগের চিত্র পাওয়া গেলেও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে গল্পকার তার বিপরীত চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন—'এমন আকাশ ভাঙা বৃষ্টিতে কলকাতা কেমন মুহূর্তে ঝলমলে হয়ে ওঠে, বৃষ্টির মধ্যেই।'[২৭] প্রকৃতির যেমন দ্বৈত রূপের পরিচয় তিনি গল্পের শুরুতেই দিয়েছেন তেমনি সমাজ বাস্তবতার দুই ভিন্নতর রূপই তুলে ধরেছেন। বাস যাত্রী নির্মল ঘোষ, যার ভাবনা এবং অভিজ্ঞতার সংঘর্ষে ও সমন্বয়ের তার ছবি ধরা পড়েছে গল্পে, সে একই বৃষ্টির দুই বিপরীত চেহারা খুঁজে পায়। গ্রামের বৃষ্টির সঙ্গে শহরাঞ্চলের বৃষ্টির মধ্যে সে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখতে পায়। শুধু তাই নয় তার জীবন জীবিকাগত রূপান্তরের ছবিও তার কাছে পরিস্কার হয়ে ধরা দেয়। সাদা-কালো ছবি বাতিল হওয়ার পর নির্মল ক্যামেরার জগৎ থেকে নির্বাসিত হয়ে টিভি সিরিয়ালের প্রোডাকসন ম্যানেজারির কাজ নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু অতীতের স্মৃতি তাকে প্রতি মূহূর্তে আচ্ছন্ন করে। ক্যামেরার লেন্সে চোখ দিয়ে দেখা ও খোলা চোখে দেখার মধ্যে বাস্তবতার দুই ভিন্নতর রূপ তার কাছে ধরা পড়ে। সেই সঙ্গে গল্পের কাহিনিতে উঠে এসেছে মাতৃদুগ্ধের প্রসঙ্গ। দুই বন্ধু নির্মল ও প্রসাদের কথাবার্তায় মায়ের বুকের দুধের প্রসঙ্গ ধীরে ধীরে বদলে যায় কোন মেয়ের বুকের কথায়, উঠে আসে ব্লু ফ্লিমের বাণিজ্যিক

রেটের কথা। মায়ের দুধের বিকল্পহীনতার ভেতর ধরা পড়ে সমাজ বাস্তবতার অবক্ষয়ের চিত্র। গ্রাম-শহরের বৃষ্টি বদলের মতন নির্মলের ক্যামেরার সাদা-কালো ছবি বদলে যায় বাণিজ্যিক চলচিত্রের জগতে। কিন্তু এটা তার ব্যক্তি ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ইচ্ছার বিরুদ্ধে জীবন-জীবিকার এই নতুন পেশা তার মানবিক সত্তাকে কোথাও যেন পীড়িত করে, বুকের ভিতরের অদম্য গোপন জ্বালায় নির্মল ঘোষ তার ক্যামেরার লেন্সে চোখ রাখার শিল্পী সত্তা হারিয়ে ফেলেন। তিনি বুঝতে পারেন না সাদা-কালো ছবি থেকে রঙিন বাণিজ্যিক চলচিত্রে যাত্রার কারণ কি? কেননা, যেখানে 'মাতৃ স্তন' বদলে যেতে পারে কোন নারীর স্তনে। পরিবার কল্যাণের বিষয় বদলে যায় ব্লু ফ্লিমে। গল্পে নির্মল ঘোষের চিন্তা-ভাবনা-চেতনায় সামাজিক অবক্ষয়তার এই চিত্র বর্তমান সময়ে আমাদের আরও বেশি করে গ্রাস করছে। সামান্য পণ্য দ্রব্যের বিজ্ঞাপনে নারী শরীরকে এমনভাবে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয় তা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনার মতোই স্বাভাবিক ঘটনা। দেবেশ রায় সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্র এই গল্পে নিপুণ ভাবে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছেন। গল্পের নামকরণেও তিনি চমক দিয়েছেন। 'বৃষ্টিবদল'—তিনি এমন দুটি শব্দকে নিয়ে একটি শব্দ জোড় তৈরি করেছেন যা পাঠকের কাছেও অপরিচিত। 'হাওয়া-বদল' শব্দটি সঙ্গে আমাদের পরিচিতি রয়েছে, কিন্তু 'বৃষ্টিবদল'? 'বৃষ্টি' ও 'বদল' শব্দটির মাঝে তিনি একটি হাইফেন ও ব্যবহার করেন নি। মনে হয় তিনি এই ভাবেই একটি চিত্রকল্প তৈরি করতে চেয়েছেন। কেননা, তিনি মানেন না চিত্রকল্পের ব্যবহার নিছক কবিতা নির্ভর। তিনি গদ্যেও এর প্রয়োগ ঘটাতে সচেষ্ট ছিলেন। এবং বলা যেতে পারে এই গল্পে তিনি সফলও হয়েছেন।

১৯৫৫ সালে 'হাড়কাটা' গল্প দিয়েই দেবেশ রায় বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর যাত্রা পথের শুভারম্ভ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে নানা পথ পরিক্রমায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি নিজের স্থায়ী আসন নিশ্চিত করে নিয়েছেন। তিনি যে সময় সাহিত্যাঙ্গণে পর্দাপণ করলেন তখন বাংলা কথাসাহিত্যে বিশেষত ছোটগল্পের ক্ষেত্রে সেটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাল। বিশ শতকের পাঁচের দশকে যাঁরা লেখালেখি শুরু করেছিলেন তাঁদের অনেকের মধ্যেই গল্পের বিষয় ও ফর্ম নিয়ে নানা চর্চা চলছিল। তাঁর বিষয় ও ফর্মের দিক থেকে বাংলা ছোটগল্পের একটা পরিবর্তন আনতে চাইছিলেন। শ্রেণিচেতনার ধারণা থেকে সরে এসে

গল্পে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন ব্যক্তিচেতনার কথা। সেই সঙ্গে কবিতার চিত্রকল্পকে গল্পে তুলে আনতে চেয়েছেন। ফলে তাদের গল্পের চরিত্রগুলির মধ্যে আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবের পরিচয় ফুটে উঠে তেমনি তাদের এই আত্মকেন্দ্রিকতাই তাদের ক্রমশ নিয়ে যায় বিচ্ছিন্নতায়। বিশ শতকের পাঁচের দশকে সাহিত্যচর্চা শুরু করেও দেবেশ রায় কিন্তু সমকালীন লেখকদের মত গল্পের ফর্ম নিয়ে তেমন চর্চা করেন নি। বরং বলা ভাল তাঁর বিষয়ই ফর্ম হয়ে উঠেছে। ফর্মের অহেতুক চর্চায় তাঁর গল্প রস আস্বাদনে হানি হতে পারে। তিনি প্রায় একই বিষয়কে নিয়ে নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। সেক্ষেত্রে তিনি প্রতিবারেই সমাজ-বাস্তবতার এক-একটি নতুন দিক উন্মোচিত করেছেন। ব্যক্তিজীবনে রাজনীতি ও সাংবাদিকতা তাঁর গল্পের বিষয়কে যেমন পরিণত করেছে তেমনি সমকালীন সমাজ ব্যবস্থার নানারূপ তাঁর গল্প-কাহিনির জোগান দিয়েছেন। উপন্যাস লেখা শুরুর পূর্বে তাঁর গল্পের আয়তনের সঙ্গে পরবর্তীকালে রচিত গল্পগুলির আয়তনের পার্থক্য বুঝে নিতে আমাদের অসুবিধে হয় না। প্রথম দিকের রচিত গল্পগুলির এক মুখীনতা শেষের দিকের গল্পগুলিতে আর তেমন ভাবে রক্ষিত হয়নি।

দেবেশ রায়ের গল্পসমগ্র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৯২ সালে। এই খণ্ডের ভূমিকা অংশে তিনি গল্পগুলির রচনাকাল সম্পর্কে সেই সময়ে তাঁর লেখার পরিধি নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। প্রথম খণ্ডের গল্পগুলির রচনাকাল ১৯৫৫ থেকে ১৯৬১-র মধ্যে। এই খণ্ডের গল্পগুলি লেখার সময় তিনি গল্প ছাড়া অন্য কোন লেখালেখির কথা ভাবতেই শুরু করেননি। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই বাংলা গল্পে আধুনিকতার একটা ভিন্ন সংজ্ঞা খোঁজা শুরু হয়। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে শাখার কবিতার তুলনায় কথাসাহিত্যে আধুনিকতা অনেকটাই বিলম্বিত। গল্পের নামকরণ, সংলাপ ধীরে ধীরে বদলাতে শুরু করে এই সময় থেকেই। এই খণ্ডের গল্পগুলিতে সেই সময়ের সাহিত্যচর্চার পরিবেশ সম্পর্কে যেমন আভাস পাওয়া যায়, পাশাপাশি আবাল্য রাজনীতির পরিসরে বড় হয়ে ওঠা দেবেশ রায়ের এই খণ্ডের গল্পগুলিতে রাজনীতির প্রসঙ্গ তেমনভাবে ফুটে না উঠলেও ১৯৬২-র ভারত-চীন যুদ্ধ তাঁর সংবেদনশীল মনকে নিঃসন্দেহে নাড়া দিয়েছিল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এই পর্বের গল্পগুলিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির কথাকেই তিনি নানা ভঙ্গিতে পাঠকের

সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন। তরুণ বয়সে লেখা এই গল্পগুলিতে যেমন বেকারত্বের যন্ত্রণার কথা বলেছেন, তেমনি সমাজে নারীর অবস্থান ও সামাজিক মূল্যবোধ এবং ক্রমশ মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চিত্র সুনিপুণ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

১৯৬২ থেকে ১৯৬৭ সাল এই সময়ের মধ্যে রচিত গল্পগুলি নিয়েই প্রকাশিত হয় গল্পসমগ্রের দ্বিতীয় খণ্ড। এই খণ্ডে মোট ২৩টি গল্প সংকলিত হয়েছে। ১৯৬২-র ভারত-চীন যুদ্ধের সমসাময়িক বা কিছু পরে লেখা এই গল্পগুলিতে স্বভাবতই রাজনীতির প্রসঙ্গ আসতে শুরু করেছিল। এই খণ্ডের ভূমিকা অংশে তিনি জানিয়েছেন—

> ''গল্পগুলি লেখার সময়, তখন নিজেরই চোখে পড়ে যায় এই সময় দলীয় রাজনীতির বাধ্যতায় সংসদীয় রাজনীতির নিয়মে, সাংগঠনিক রাজনীতির অনিবার্যতায় যতই আমাকে দৈনন্দিন কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশদে ঢুকতে হয়েছিল আমার গল্পগুলোর বাক্য ততই হয়ে উঠতে চেয়েছিল জটিলতর, প্রত্যক্ষ ঘটনা ততই অন্বিত হয়ে যাচ্ছিল পরোক্ষের সঙ্গে।''[২৮]

এই পর্বের অধিকাংশ গল্পগুলিতে সরাসরি রাজনীতির প্রসঙ্গ এসেছে। সমকালীন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ডামাডোলের ছবি ধরা পড়ে 'ক্ষয় ও তার প্রতিকার', 'উদ্বাস্তু', 'বটা সান্যালের অন্তর্দ্বন্দ্ব', 'যুযুৎসু' কিংবা 'ধর্না' গল্পে। রাজনীতির অভিজ্ঞতা তাঁর গল্পের বিষয়কে কীভাবে পরিপূর্ণতা দান ও নিয়ন্ত্রিত করেছে এই গল্পগুলিই তার অন্যতম প্রমাণ। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে এই কথাটাও বলে রাখা প্রয়োজন রাজনৈতিক কোন দ্বন্দ্বময়তাকে তিনি হয়তো রূপকের আশ্রয়ে গল্পে ধরতে চান নি বরং রাজনীতির বাস্তব অভিজ্ঞতায় তিনি তা অতিক্রম করতে পেরেছেন। তাইতো প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গের কোন চরিত্রকে রাষ্ট্রীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে গল্পের বিষয় হিসেবে নির্বাচন করলেও সেগুলির বিশেষ থেকে সার্বিকতায় উত্তীর্ণ হতে কোন অসুবিধা হয়নি।

১৯৬৮ থেকে ১৯৭৭ এর মধ্যে রচিত গল্পগুলি নিয়েই প্রকাশিত হয় গল্পসমগ্র তৃতীয় খণ্ড। এই খণ্ডে মোট সংকলিত গল্প সংখ্যা ১২টি। তৃতীয় খণ্ডের গল্পগুলির রচনা কালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য রাজনীতিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। যেমন '৬৭র নির্বাচনে

এমন একটা জয় ঘটেছিল বামপন্থীদের, যে জয়ের জন্য তাঁদের কোন কৃতিত্বও ছিল না। তাঁদের কোন প্রত্যাশাও ছিল না। অথচ সেই জয়ই তাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার স্বাদ এনে দিল। তেমনি সেই সময় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল এই রকম—'৬৭তেই প্রথমে অনেকগুলি রাজ্যে অনেকগুলি দলের সরকার আর কেন্দ্রে অন্য আর এক দলের সরকার—বাস্তবতার এই চিত্র তখন ভারতীয় রাজনীতিতে। কমিউনিস্ট মতাদর্শে দীক্ষিত দেবেশ রায় এই সময়ের রাজনীতি সম্পর্কে বলেছেন—

> ''১৯৬৭ থেকে ১৯৭৭ এই পুরো দশকটাই গেছে এই বাস্তবতার সঙ্গে আমাদের সাংবিধানিক গণতন্ত্রকে মেলাতে। শাসক দল হিসেবে কংগ্রেস যে আর একমাত্র দল থাকছে না ও ভারতীয় গণতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বিভিন্ন রাজ্যে যে বিভিন্ন শাসকদল হিসেবে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারছে—তা সাব্যস্ত হতে এই পুরো একটি দশক লেগে গেল। আর ৬৭ থেকে ৭৭ কী এক আক্রমণের দশক, বামপন্থীদের আত্মহননের দশক, ভুল যুদ্ধে ভুল পক্ষে আত্ম বিসর্জনের দশক।''[২৯]

কিন্তু '৬৯ এর নির্বাচনে প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী ও তার সহযোগী শক্তিগুলি আত্ম কলহে মেতে ওঠে। সেই সময় উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়িতে কৃষি-শ্রমিক আন্দোলন ক্রমশ বদলে যায় আক্রমণের আন্দোলনে শুরু হয় প্রতিপক্ষকে খুন করার এক গোপন ষড়যন্ত্রমূলক রাজনীতি। এই ষড়যন্ত্র মূলক খুনের রাজনীতির চিত্রই যেন বির্ধৃত হয় 'রাষ্ট্রপতির শাসনে' গল্পটিতে। যেখানে বাড়ির পেছনে পড়ে থাকতে দেখা যায় পচা গলিত একটি মানুষের মৃতদেহ। অজ্ঞাত পরিচিত এই মৃতদেহকে নিয়েই গল্পটির কাহিনি সংঘটিত হয়েছে। সন্দেহ ও বিশ্বাসহীনতার এই দশকে তিনি একে একে লিখলেন 'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে', 'জয় যাত্রায় যাও হে', 'সাপের সঙ্গে সহবাস', 'কয়েদখানা', 'অনৈতিহাসিক', 'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম' এছাড়াও 'রক্তের অসুখ', কিংবা 'মূর্তির মানুষ'—এই সময়ে রচিত গল্পগুলির শিরোনাম দেখলেই বুঝতে অসুবিধা হয় না সমকালীন অস্থির সময়ের রাজনৈতিক ও সমাজ বাস্তবতার ছবি ফুটিয়ে তোলায় তাঁর এই খণ্ডের

গল্পগুলির অন্যতম উদ্দেশ্য। গল্প সমগ্রের তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকা অংশে তিনি লিখছেন—

> ''৭৭ সালে, এত রক্তক্ষয় ও আত্মবিশ্বাসের পর আবার পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা তৈরি হল। তত দিনে, তার আগে পরে, আমার লেখা হয়ে গেছে 'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম', 'রক্তের অসুখ', 'মূর্তির মানুষ'।''[৩০]

দেবেশ রায়ের গল্পসমগ্রের প্রায় প্রতিটি গল্পের কাহিনিতে সরাসরি কিংবা ব্যঞ্জনায় উঠে এসেছে সমকালীন সমাজের রাজনীতির কথা। এছাড়াও এই সময় থেকেই তাঁর গল্পগুলির আখ্যাং ও আয়তন ক্রমশ যেন বড় হতে থাকে। এই সম্পর্কে তিনি নিজেই জানিয়েছেন—

> ''তখন আমার কাছে সমস্ত লেখাই আসত ছোটগল্পের আকার নিয়ে, অনেক সময়ই বিদ্যুচ্চমকে, কখনো বা ভাবনা চিন্তার পরে। যেভাবেই আসুক না কেন আমি কখনো ছোটগল্পের সীমানা আমার কল্পনায় ভাঙতে পারতাম না। হয়ত সেইসব গল্প ছোটগল্পের সীমার মধ্যে আটকে থাকতে পারত না। তাই আমার গল্পগুলো ক্রমেই আকারে বড় হয়ে যাচ্ছিল।''[৩১]

১৯৭৮ থেকে ১৯৮৬ সালের ভিতরে রচিত গল্পগুলি নিয়েই প্রকাশিত হয় লেখকের গল্পসমগ্র চতুর্থ খণ্ড। চাকরি বদলের সূত্রে তিনি জলপাইগুড়ি থেকে পাকাপাকি ভাবে কলকাতায় চলে যান ১৯৭৫ সালে। এই খণ্ডের গল্পগুলি যে সময় ধরে রচিত হয়েছিল সেই সময়ের মধ্যে লেখকের ব্যক্তিজীবনকে দারুণভাবে নাড় দিয়েছিল দুটি মৃত্যুর ঘটনা— প্রথমত দাদা দিনেশচন্দ্র রায় দ্বিতীয়ত বন্ধু দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। চতুর্থ খণ্ডের ভূমিকা অংশে তিনি জানিয়েছেন—

> ''পরপর দু'বছরে দাদা আর দীপেনের মৃত্যুতে আমার লেখালেখির কাজটা কেমন ফাঁকা আর অর্থহীন গেল হঠাৎ, কেমন বন্ধু শূন্য ও সমর্থন শূন্য হয়ে গেল। যেন আমার কারো কাছে কোন দায় রইল না। আমাকে নিয়েও কারো কোন দায় থাকল না। ১৯৭৯ র আমার লেখালেখি বন্ধও হয়ে যেতে পারত।''[৩২]

মূলত প্রিয় জনের চির বিচ্ছেদের ঘটনার জন্যই এই পর্বে লেখকের লেখালেখি বন্ধ না হলেও রচনা সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে যায়। চতুর্থ খণ্ডের গল্প সংখ্যা মাত্র ১০টি। বিশ শতকের আটের দশকের শেষের দিকে রাজনৈতিক অন্তর্রকলহ ও ও নকশালবাড়ির শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনে রাষ্ট্রশক্তির ক্ষমতার অপ-প্রয়োগে দলিয় মতাদর্শ ও রাষ্ট্রশক্তি সম্পর্কে লেখকের দীর্ঘ দিনের ধারণা ও বিশ্বাসবোধে একটা আঘাত হেনে ছিল। এই পর্বে এক দিকে প্রিয়জনের মৃত্যুও রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি বিশ্বাস ভেঙ্গে যাওয়া পরবর্তী সময়ে লেখককে যেন আরো বেশি করে জীবনমুখী করে তোলে। চতুর্থ খণ্ডের প্রথম দুটি গল্প 'উচ্ছেদের পর' ও 'জোতজমি' গল্পে রাজনীতির একটি প্রচ্ছন্ন বাতাবরণ রয়েছে বটে কিন্তু পরবর্তী গল্পগুলি যেমন—'যৌবন বেলা', 'শরীরের রকমফের', 'অন্ত্যেষ্টির রীতিবিধি' কিংবা 'জন্ম প্রজন্ম' এই কাহিনিতে তিনি দাম্পত্য জীবনের কথা যেমন তুলে ধরেছেন তেমনি সামাজিক মানুষের জীবন তৃষ্ণার নানান অনুসঙ্গ বিধৃত হয়েছে এই পর্বের গল্পগুলিতে। কলকাতায় যাওয়ার পর তিনি আরও বেশি করে জড়িয়ে পড়েন লেখালেখিরও জগতের সঙ্গে চতুর্থ খণ্ডের গল্পগুলি রচনার সময় যে মানসিক আঘাত তাঁর কলমকে আড়ষ্ট করেছিল পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার দায়িত্বভার গ্রহণ ও অরুণ সেন ছাড়াও অন্যান্য লেখক বন্ধুদের উৎসাহে দাদা ও দীপেনের মৃত্যুর আবেষ্টন থেকে তিনি বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন, এবং তিনি তা পেরেও ছিলেন। তাঁর পঞ্চম খণ্ডে প্রকাশিত গল্পগুলির রচনা কাল ১৯৮৭ থেকে ১৯৯৪ সাল। এই খণ্ডে সংকলিত মোট গল্প সংখ্যা ১৬টি। এই পর্বে বিশ্বায়ণের ফলে সমাজ জীবনের বিভিন্ন অনুসঙ্গকে তাঁর রচনায় স্থান দিয়েছেন, পাশাপাশি তিনি তথাকথিত আধুনিক মানসিক জটিলতা, সামাজিক মূল্যবোধ ও অবক্ষয়িত মূল্যবোধের চিত্রই এই খণ্ডের গল্পগুলির মূল বিষয়। পঞ্চম খণ্ডের অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ গল্পগুলি হল—'স্মৃতিহীন বিস্মৃতিহীন', 'বৃষ্টিবদল', 'আত্মসচেতনতার ফাঁকফোকর', 'ভয়', 'গীতাল যুগীনের নেকনোলজি গ্রহণ', 'মুখের দরদাম' ইত্যাদি।

দেবেশ রায়ের ষষ্ঠ খণ্ডে প্রকাশিত গল্পগুলির রচনাকাল ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৮ সাল। এই খণ্ডে সংকলিত হয়েছে মাত্র ৯টি গল্প। তিনি সাধারণত গল্প বা উপন্যাসের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য করতে চাননি, উপন্যাসকে অনেক সময় তিনি 'বড় গল্প' বলতেই পছন্দ করতেন। নির্দিষ্ট আয়তনে ছোটগল্পের সংজ্ঞাকে তিনি তেমন গুরুত্ব দেওয়ার পক্ষপাতি

ছিলেন না। এই খণ্ডের গল্পগুলির আয়তনের দিকে লক্ষ রাখলেই লেখকের এই বিষয়ের ধারণাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই খণ্ডের 'বাঁচা না-বাঁচার নিশানা' গল্পটির কাহিনি বিস্তার ৬১ পৃষ্ঠা জুড়ে, বেশির ভাগ গল্পগুলি আয়তন তাঁর প্রথম দিকের গল্পগুলির তুলনায় অনেকটা বড়। এই প্রসঙ্গে লেখক অবশ্য নিজেই জানিয়েছেন তাঁর ক্রমশ উপন্যাসে ডুবে যাওয়ার কথা। 'তিস্তাপুরাণ' কিংবা বাঁচা না বাঁচার নিশানা তাঁর উপন্যাসের অংশ মাত্র। এই খণ্ডের সমস্ত গল্পগুলি বিভিন্ন পত্রিকার শারদীয় সংখ্যাতেই প্রকাশিত। শারদীয় সংখ্যাগুলির বাণিজ্যিক চাহিদার কারণের হয়তো তিনি উপন্যাসের খণ্ডাংশকে গল্প রূপে প্রকাশিত করেছিলেন যেগুলি পরবর্তীকালে মূল উপন্যাসের সঙ্গে জুড়ে যায়। একজন লেখক যখন একইসঙ্গে ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনা করেছেন তখন বুঝতে হবে তিনি জীবনের খণ্ডাংশগুলিকে যেমন গুরুত্ব দিতে চান তেমনি জীবনকে তিনি ব্যাপকভাবে দেখতে আগ্রহী। যদি দেখা যায় ছোটগল্প ও উপন্যাসের মধ্যে প্রতিফলিত লেখকের জীবনদর্শন অভিন্ন তখন তিনি যাই লিখুক না কেন তিনি জীবনবাদী সাহিত্যিক। এক্ষেত্রে ছোটগল্প ও উপন্যাস অনন্য বা পরন্ধরনির্ভর। দেবেশ রায়ের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে।

পরবর্তীতে দেবেশ রায়ের অনেক গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে। তিনি জীবনকে ব্যাপক ভাবেই দেখতে চেয়েছেন। তাই ঔপন্যাসিক হিসাবে তিনি অধিক খ্যাতি ও জনপ্রিয় হয়েছেন। তাই দেবেশ রায়ের কয়েকটি উপন্যাস গল্পেরই বিস্তৃত রূপায়ন। দেবেশ রায়ের গল্পের ভিতর আমরা অনেক সময় ঔপন্যাসিক দেবেশ রায়কে দেখতে পাই।

গল্পসমগ্রের ৬টি খণ্ডে প্রকাশিত গল্পগুলি ছাড়াও পরবর্তীকালে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর অনেকগুলি গল্প প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় গল্পগুলি হল— 'পরিচয়' প্রকাশিত 'পেজমার্ক', 'রুমেলিয়াকে বাঁচানো ও রুমেলিয়ার মরে যাওয়ার সামান্য কারণগুলি', 'ক্ষিধের পোষ্ট মর্ডাণ' এছাড়াও যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত 'পাখোয়াল' কিংবা 'অন্তঃসার' পত্রিকায় 'ক্ষুরধার নগর' প্রভৃতি। গল্পগুলিতে তিনি মানব মনের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিকে সুনিপুণ শিল্পী সচেতনতায় ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। যা সমকালীন বাংলা গল্প সাহিত্যের অসামান্য সম্পদ।

তথ্যসূত্র :

১. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র, প্রথম খণ্ড, ভূমিকা অংশ, পৃ. ১১।

২. তদেব, : পৃ. ১১।

৩. তদেব, : পৃ. ১২।

৪. তদেব, : পৃ. ৮৯।

৫. তদেব, : পৃ. ৯১।

৬. তদেব, : পৃ. ৯২।

৭. তদেব, : পৃ. ৯৪।

৮. তদেব, : পৃ. ৯৪।

৯. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র, প্রথম খণ্ড, 'পা', পৃ. ১৫৭।

১০. তদেব, : পৃ. ১৬৪।

১১. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র, প্রথম খণ্ড, 'পশ্চাৎভূমি', পৃ. ২২৩।

১২. তদেব, : গল্পসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, 'নিরস্ত্রীকরণ কেন?', পৃ. ২১।

১৩. তদেব, : পৃ. ৩১।

১৪. তদেব, : পৃ. ৩৪।

১৫. তদেব, : পৃ. ৩৫।

১৬. তদেব, : পৃ. ৩৫।

১৭. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, 'উদ্বাস্তু', পৃ. ৪০।

১৮. তদেব, : পৃ. ৫২।

১৯. তদেব, : পৃ. ৫২।

২০. তদেব, : পৃ. ৫২।

২১. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, 'অপভাবনা', পৃ. ১৭৭।

২২. তদেব, : গল্পসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, 'রঞ্জুর রক্ত', পৃ. ১৭৯।

২৩. তদেব, : পৃ. ১৮৬।

২৪. তদেব, : পৃ. ১৮৬।

২৫. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, ‘রাষ্ট্রপতি শাসনে’, পৃ. ২৬।

২৬. তদেব, : গল্পসমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, ‘কয়েদখানা’, পৃ. ১২২।

২৭. তদেব, : গল্পসমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, ‘বৃষ্টিবদল’, পৃ. ১২২।

২৮. তদেব, : গল্পসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ৩।

২৯. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, ভূমিকা অংশ, পৃ. ৪।

৩০. তদেব, : পৃ. ১২।

৩১. তদেব, : পৃ. ১৩।

৩২. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র, চতুর্থ খণ্ড, ভূমিকা অংশ, পৃ. ১৩।